উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণের লেসনশীট

প্রশিক্ষণের বিষয়: : ভূট্টা চাষে সেচ পদ্ধতি, শীষকাটা লেদা পোকার দমন ব্যবস্থা, জাঁয়ান্ট মিলিবাগ পোকার দমন ব্যবস্থাপনা, গোলআলু চাষ পদ্ধতি, কলার বিটল পোকার সমন্বিত দমন পদ্ধতি।

পক্ষ: নভেম্বর/২০২১, ১ম পক্ষ। **তারিখ : :** ০১/১১/২০২১ খ্রিঃ ।

আয়োজনে ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দশমিনা, পটুয়াখালী।

-সূচীপত্র-

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
০১	ভূট্টা চাষে সেচ পদ্ধতি	০১
০২	শীষকাটা লেদা পোকার দমন ব্যবস্থা	০২-০৩
০৩	জাঁয়ান্ট মিলিবাগ পোকার দমন ব্যবস্থাপনা	০৩-০৪
০৪	নামাজ ও খাবারের বিরতি	০৪-০৫
০৫	গোলআলু চাষ পদ্ধতি	০৫-০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
দশমিনা, পটুয়াখালী।

উপসহকারী কৃষিকর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ সিডিউল।

০১. **অর্থ বছর** : ২০২১-২০২২ খ্রিঃ।

০২. **পক্ষ** : নভেম্বর/২০২১, ১ম পক্ষ।

০৩. **তারিখ** : ০১/১১/২০২১ খ্রিঃ ।

০৪. **প্রশিক্ষণের বিষয়** : ভূট্টা চাষে সেচ পদ্ধতি, শীষকাটা লেদা পোকার দমন ব্যবস্থা, জাঁয়ান্ট মিলিবাগ পোকার দমন ব্যবস্থাপনা, গোলআলু চাষ পদ্ধতি, কলার বিটল পোকার সমন্বিত দমন পদ্ধতি।

০৫. **প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী** : ১৬ জন।

০৬. **প্রশিক্ষণের ধরণ** : লেকচারভিত্তিক ও ব্যবহারিক।

০৭. **প্রশিক্ষণের ভেন্যু** : উপজেলা কৃষি অফিসারের প্রশিক্ষণ রুম।

০৮. **প্রশিক্ষণ কারিকুলাম** :

ক্র. নং	সময়	আলোচনারবিষয়	ফ্যাসিলিটেটর
০১	১০:০০-১১:০০	ভূট্টা চাষে সেচ পদ্ধতি	মোঃ নাহিদ হাসান কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার দশমিনা, পটুয়াখালী।
০২	১১:০০-১২:০০	শীষকাটা লেদা পোকার দমন ব্যবস্থা	মোঃ জাফর আহমেদ উপজেলা কৃষি অফিসার, দশমিনা, পটুয়াখালী।
০৩	১২:০০-১:০০	জাঁয়ান্ট মিলিবাগ পোকার দমন ব্যবস্থাপনা	মোঃ নাহিদ হাসান কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার দশমিনা, পটুয়াখালী।
০৪	১:০০-২.৩০	নামাজ ও খাবারের বিরতি	-
০৫	২:৩০-৩:৩০	গোলআলু চাষ পদ্ধতি	মোঃ জাফর আহমেদ উপজেলা কৃষি অফিসার, দশমিনা, পটুয়াখালী।
০৬	৩.৩০-৪.৩০	কলার বিটল পোকার সমন্বিত দমন পদ্ধতি	মোঃ নাহিদ হাসান কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার দশমিনা, পটুয়াখালী।

মোঃ জাফর আহমেদ
উপজেলা কৃষি অফিসার
দশমিনা, পটুয়াখালী।

ভূট্টা চাষে সেচ পদ্ধতি

রবি মৌসুমে সেচ প্রয়োগ করলে ভুট্টার আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে। বীজ বপনের ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ, ৩০ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সেচ, ৬০ থেকে ৭০ দিনের মধ্যে তৃতীয় সেচ এবং ৮৫ থেকে ৮৯ দিনের মধ্যে চতুর্থ সেচ দেয়া যেতে পারে। ফুল ফোটা ও দানা বাঁধার সময় জমিতে পানি জমে থাকা ক্ষতিকর। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। জমিতে আগাছা দেখা দিলে দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফসলের ভালো ফলনের জন্য সার ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। ভুট্টার কম্পোজিট জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে রবি মৌসুমে ১৭২ থেকে ৩১২ কেজি এবং খরিফ মৌসুমে ২১৬ থেকে ২৬৪ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োজন হয়। হাইব্রিড জাতের জন্য রবি মৌসুমে এ চাহিদা ৫০০ থেকে ৫৫০ কেজি। কম্পোজিট জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, বোরিক এসিড ও গোবর সার প্রয়োজন রবি মৌসুমে যথাক্রমে ১৬৮ থেকে ২১৬ কেজি, ৯৬ থেকে ১৪৪ কেজি, ১৪৪ থেকে ১৬৮ কেজি, ১০ থেকে ১৫ কেজি, ৫ থেকে ৭ কেজি ও ৪ থেকে ৬ টন এবং খরিফ মৌসুমে যথাক্রমে ১৩২ থেকে ২১৬ কেজি, ৭২ থেকে ১২০ কেজি, ৯৬ থেকে ১৪৪ কেজি, ৭ থেকে ১২ কেজি, ৫ থেকে ৭ কেজি ও ৪ থেকে ৬ টন।

হাইব্রিড জাতের জন্য রবি মৌসুমে প্রয়োজন ২৪০ থেকে ২৬০ কেজি টিএসপি, ১৮০ থেকে ২২০ কেজি এমওপি, ২৪০ থেকে ২৬০ কেজি জিপসাম, ১০ থেকে ১৫ কেজি জিংক সালফেট, ৫ থেকে ৭ কেজি বোরিক এসিড এবং ৪ থেকে ৬ টন গোবর সার।

জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে মোট ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান ২ ভাগ করে প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ২৫ থেকে ৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৪০ থেকে ৫০ দিন পর উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

শীষকাটা লেদা পোকার দমন ব্যবস্থা

জৈবিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দমনঃ

- আক্রান্ত ক্ষেতে সেচ দিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া।
- ডালপালা পুঁতে পার্সিং করে এদের সংখ্যা কমানো যায়।
- আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক মথ ধরে মেরে ফেলা।
- ধান কাটার পর শস্যের অবশিষ্ট অংশ পুড়িয়ে ফেলা।

রাসায়নিক পদ্ধতিতে দমনঃ

- লেদা পোকা দমনের জন্য- ফাইটার ২.৫ ই সি ১০ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে। একর প্রতি মাত্রা ২০০ মিলি।
- অথবা গোলা ৪৮ ই সি ১০ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে। একর প্রতি মাত্রা ২০০ মিলি।
- অথবা এসিমিক্স ৫৫ ই সি ২০ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে। একর প্রতি মাত্রা ২০০ মিলি।
- অথবা ব্রিফার ৫ জি প্রতি বিঘাতে ১.৩ কেজি করে প্রয়োগ করতে হবে। একর প্রতি মাত্রা ৪ কেজি।

জাঁয়ান্ট মিলিবাগ পোকার দমন ব্যবস্থাপনা

১. বাগানে জন্মানো আগাছা ও অন্যান্য পোষক উদ্ভিদ তুলে বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২. গ্রীষ্মকালে (বিশেষত সেপ্টেম্বর-অক্টেবর মাসে) বাগান ভালো করে চাষ দিতে হবে বা পূর্ববর্তী বছরে আক্রান্ত গাছসমূহের গোড়ার মাটি কোদাল দিয়ে আলগা ও এপিঠ-ওপিঠ করে দিতে হবে যাতে মাটির নিচে থাকা ডিম উপরে উঠে আসে এবং পাখি ও অন্যান্য শিকারী পোকার কাছে তা উন্মুক্ত হয়, তাছাড়া রোদে পোকার ডিম নষ্ট হয়ে যায়।

৩. যেহেতু নিম্ফগুলো গাছ বেয়ে ওপরে উঠে তাই নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হতেই গাছের গোড়ায় মাটি থেকে ১ মিটার উঁচুতে ৮-১০ ইঞ্চি চওড়া প্লাস্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ড গাছের চতুর্দিকে আবৃত করে দিলে এরা বার বার ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করে পরিশ্রান্ত হয়ে মারা যায়। অনেক সময় প্লাস্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ডের নিচের অংশে নিম্ফগুলো জমা হয়। এ অবস্থায় এদের সহজেই পিটিয়ে বা একসাথে করে আগুনে পুড়িয়ে মারা সম্ভব অথবা জমাকৃত পোকার উপর কীটনাশক ¯েপ্র করে দমন করা যায়। এসময় নিম্ফগুলোকে গাছে উঠা হতে নিবৃত করতে পারলে এ পোকার আক্রমণ পুরোপুরিভাবে দমন করা সম্ভব।

৪. যদি কোনো কারণে নিম্ফগুলো গাছ বেয়ে উপরে উঠে যায় তবে শুধুমাত্র গাছের আক্রান্ত অংশে (Spot application) সংস্পর্শ ও পাকস্থলী (Contact and stomach) কীটনাশক বিধি মোতাবেক প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তবে প্রাথমিকভাবে অল্প কিছু পরিমাণ নিম্ফ গাছ বেয়ে উপরে উঠে গেলে কেবলমাত্র গুঁড়া সাবান মিশ্রিত পানি (প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে) স্প্রে করে এ পোকার আক্রমণ রোধ করা সম্ভব। তবে ব্যাপকভাবে আক্রমণের ক্ষেত্রে কীটনাশক প্রয়োগের বিকল্প নেই। যেহেতু এ পোকাটির বহিরাবরণ ওয়াক্সি পাউডার জাতীয় পদার্থ দিয়ে সুরক্ষিত থাকে সেহেতু পরীক্ষিত কীটনাশক ছাড়া এটি দমন করা দুরূহ। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ক্লোরপাইরিফস (ডারসবান ২০ ইসি বা এ জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩ মিলি. হারে) এবং তার ৩-৪ দিন পর কার্বারাইল (সেভিন ৮৫ এসপি বা এ জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে) আক্রান্ত অংশে ¯েপ্র করতে হবে। প্রতি ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার এভাবে স্প্রে করলে এ পোকা সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব।

ছাতরা পোকার ব্যাপকভিত্তিক আক্রমণের ফলে সৃষ্ট অন্যান্য অসুবিধাগুলো

যেহেতু এ পোকাটি লোকালয়ে অবস্থিত বিভিন্ন কাঁঠাল, কড়ই বা আমগাছে আক্রমণ করে থাকে সেহেতু এদের ব্যাপকভিত্তিক আক্রমণের ফলে জনমনে অনেক সময় ভীতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত যখন সদ্য ফোটা নিম্ফ গাছ বেয়ে উপরে উঠে অথবা ঘাস বা বাগানের ছোট ছোট গাছে ইতঃস্তত ঘুরাফেরা বা অবস্থান করে এবং পরে এপ্রিল-মে মাসে স্ত্রী পোকাগুলো দলবদ্ধভাবে গাছ থেকে মাটিতে নেমে আসে তখন এরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে এপ্রিল-মে মাসে স্ত্রী পোকাগুলো ডিম পাড়ার জন্য অধির থাকে বলে উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে এরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে এক্ষেত্রে জনমনে ভীতির সঞ্চার হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এ পোকাটি অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির। মানুষের শরীরে ক্ষতিসাধিত হয় এ রকম কোনো উপাদান এ পোকাটির মধ্যে নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্ত্রী পোকাগুলো যেহেতু উড়তে পারে না সেহেতু এদের ঝাঁটা বা অন্য কিছুর সাহায্যে একসাথে করে পুড়িয়ে ফেলা বা একটু গভীর (কমপক্ষে এক-দেড় ফুট) গর্ত করে পুঁতে ফেলা উচিত। যেসব স্থানে এ পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় সে স্থানগুলোতে পরবর্তী নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা দরকার এবং সদ্য ফোটা নিম্ফ গাছ বেয়ে উপরে উঠা শুরু করা মাত্রই উপরে বর্ণিত দমন ব্যবস্থাপনাগুলো প্রয়োগ করা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার প্রথম হতে সাবধানতা অবলম্বন করলে এপোকা দমন করা মোটেই কঠিন নয়।

গোলআলু চাষ পদ্ধতি

আলুর জাত নির্বাচন

ভালো জাতের আলুর চাষ করলে একদিকে চাষি আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে আবার অন্যদিকে ফলনও আশানুরূপ পাওয়া যায়। তাই জাত নির্বাচন অবশ্যই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশে যেসব জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে তা হলো দেশি জাত এবং উচ্চফলনশীল উন্নত জাত। বর্তমানে আলু চাষের মোট জমির শতকরা ৬৫ ভাগ জমিতে উন্নত জাতের আলু এবং ৩৫ ভাগ জমিতে দেশি জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে।

দেশি জাত

ফলন কম হলেও দেশি জাতের বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘদিন ঘরে রেখে খাওয়া যায়। দেশি জাতের আলু ছোট ও ওজন ৫ থেকে ৪৮ গ্রাম। কিছু দেশি জাত আছে যা উন্নত জাতের চেয়ে নাবি। দেশি জাতের আলু তুলনামূলকভাবে খেতে খুব সুস্বাদু। বর্তমানে বাজারমূল্যে উন্নত জাতের চেয়ে দেশি জাতের আলু বেশি দামে বিক্রি হয়। দেশি জাতসমূহের মধ্যে আউশা, চল্লিশা, দোহাজারী লাল, ফেইন্তাশীল, হাসরাই, লাল পাকরী, লালশীল, পাটনাই, সাদা গুটি শীল বিলাতী ও সূর্যমূখী। দেশি জাতগুলো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। দেখা গেছে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দেশি জাতের আলুর ফলন কমে যায়। বীজের মাধ্যমেই এ রোগটি ছড়িয়ে থাকে। তাই দেশি জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে রোগমুক্ত বীজ সংগ্রহ করে লাগানো উচিত।

উচ্চফলনশীল

১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যেসব উন্নত জাতের আলুর চাষ হচ্ছে তার মধ্যে হিরা, আইলসা, পেট্রোনিস, মুল্টা, ডায়ামন্ট, কার্ডিনাল, মন্ডিয়াল, কুফরী সিন্দুরী, চমক, ধীরা, গ্রানোলা, ক্লিওপেট্রা ও চিনেলা জাতটি সবচেয়ে বেশি চাষ হয়েছে। বারি টিপিক্রস-১ এবং বারি টিপিক্রস-২ নামে ২টি হাইব্রিড জাতের আলু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়াও বারি আলু-১ (হীরা), বারি আলু-৪ (আইলসা), বারি আলু-৭ (ডায়ামন্ট), বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল), বারি আলু-১১ (চমক), বারি আলু-১২ (ধীরা), বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা), বারি আলু-১৫ (বিনেলা), বারি আলু-১৬ (আরিন্দা), বারি আলু-১৭ (রাজা), বারি আলু-১৮ (বারাকা), বারি আলু-১৯ (বিন্টজে) এবং বারি আলু-২০ (জারলা) জাত রয়েছে। এসব জাত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা থেকে উদ্ভাবিত। এগুলো সবই উচ্চফলনশীল জাত।

উৎপাদন পদ্ধতি

বাংলাদেশের কৃষক আলু উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু এগুলো বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করলে একদিকে যেমন কৃষক লাভবান হবে অন্যদিকে ফলনও বাড়বে।

মাটি নির্বাচন

আলু চাষের জন্য বেলে দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী।

উৎপাদন মৌসুম

বাংলাদেশে সাধারণত নভেম্বর মাসের আগে আলু লাগানো যায় না, কারণ তার আগে জমি তৈরি সম্ভব হয় না। নভেম্বরের পরে আলু লাগালে ফলন কমে যায়। এ জন্য উত্তরাঞ্চলে মধ্য-কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণ ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

বীজের হার

প্রতি হেক্টরে ১.৫ টন। রোপণের দূরত্ব ৬০X২৫ সে. মি. (আস্ত আলু) এবং ৪৫X১৫ সে. মি. (কাটা আলু)। কৃষকেরা ঘরে সংরক্ষিত দেশি জাতের যে বীজ ব্যবহার করেন তা খুবই নিকৃষ্টমানের। কোনো কোনো সময় হিমাগারে থাকা অবস্থায় আলুর মাঝখানে কাল দাগ দেখা যায়। মাঠে থাকা অবস্থায় বা সংরক্ষণের সময় যদি উচ্চ তাপমাত্রায় (৩৫ ডিগ্রি সে. এর উপরে) থাকলে বা অক্সিজেন বিহীন অবস্থায় থাকলে এমনটি হয়। এ রোগটিকে ব্লাকহার্ট রোগ বলে। আবার যদি হিমাগারের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সে. এর নিচে চলে যায় তাহলে আলু শীতলাঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ধরনের আলু গজাবে না। তাই কৃষক অবশ্যই এদিকটা বিবেচনা করে আলু বীজ সংগ্রহ করবেন।

বীজ শোধন

যদি সম্ভব হয় আলু বীজকে মারকিউরিক ক্লোরাইড এক গ্রাম নিয়ে ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১-২ ঘণ্টা ডুবিয়ে নিলে ভালো হয়। আবার বোরিক এসিডের ০.৫% দ্রবণে আলু বীজ ১৫-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। কাটা বীজ বা গজানো বীজ শোধন করা যাবে না।

বীজের আকার

২৫-৩৫ গ্রাম ওজনের বীজ রোপণ করা সবদিক থেকে ভালো।

সারের পরিমাণ

কৃষকেরা যদি আলুর উচ্চফলন পেতে চান তাহলে সুষম সারের বিকল্প নেই। সাধারণ কৃষকের জন্য আলু চাষে নিম্নোক্ত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ইউরিয়া - ২২০-২৫০ কেজি/হেক্টর
টিএসপি - ১২০-১৫০ কেজি/হেক্টর
এমওপি - ২২০-২৫০ কেজি/হেক্টর
জিপসাম - ১০০-১২০ কেজি/হেক্টর
জিংক সালফেট - ৮-১০ কেজি/হেক্টর

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট - ৮০-১০০ কেজি/হেক্টর
(অম্লীয় বেলে মাটির জন্য)
বোরন - ৮-১০ কেজি/হেক্টর
গোবর - ৮-১০ টন/হেক্টর
জমিতে যদি সবুজ সার প্রয়োগ করা হয় তাহলে গোবরের প্রয়োজন নেই।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

গোবর, অর্ধেক ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক সালফেট আলু রোপণের আগেই মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ৩০-৩৫ দিন পর যখন আলুর নালা তৈরি করে মাটি তোলার সময় দিতে হবে।

জলবায়ু

আলু চাষের জন্য তাপমাত্রা ও আলোর প্রভাব খুবই প্রকট, দেখা গেছে ১৫ ডিগ্রি - ২০ ডিগ্রি সে. গড় তাপমাত্রা আলু চাষের জন্য খুবই উপযোগী। ২০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রার ওপরে গেলে ফলন কমতে থাকে আবার ৩০ ডিগ্রি সে. এ আলু উৎপাদন ক্ষমতা লোপ পায়। আবার ১০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রার নিচে গেলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। এজন্য আলু লাগানোর সময় ২০ ডিগ্রি - ২৫ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ তাপমাত্রায় গাছ দ্রুত গজায়। আবার বাংলাদেশে দেখা গেছে যে বছর মেঘমুক্ত আকাশ ও তাপমাত্রা সঠিকভাবে থাকে সে বছর আলুর গড় ফলন ১০-১৫% বেড়ে যায়।

সেচ
আলু শীতকালীন সবজি। আর শীতকাল শুষ্ক এজন্য আলু চাষে সেচের প্রয়োজন হয়। পানির প্রাপ্যতা কম হলে আলুর ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বীজ আলু বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে একবার সেচ দিতে হবে। ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সেচ এবং ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে আরেকটি সেচ দিতে হবে। তবে দেশের উত্তরাঞ্চলে ৮-১০ দিন পর সেচ দিলে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

পরিচর্যা
আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি দেয়া দরকার এবং সেই সাথে আগাছা দমন করতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড় রোগের প্রতিকার

আলু মাঠে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন রোগ দেখা যায়। এর মধ্যে আলুর মড়ক রোগ, আলুর আগাম রোগ যা পাতা পোড়ানো বা কুঁচকে যাওয়ার মতো দেখায়, কান্ড ও আলু পচা রোগ, ঢলে পড়া ও বাদামি পচন রোগ, আলুর দাঁদ রোগ, আলুর মোজাইক রোগ, আলুর শুকনো পচা রোগ, আলুর নরম পচা রোগ অন্যতম।

রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। রোগ দেখা দিলে সেচ দেয়া বাদ রাখতে হবে এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে বালাইনাশক দিতে হবে।

পোকামাকড় দমন

আলু ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় দেখা যায়। এদের মধ্যে আলুর কাটুই পোকা অন্যতম। এ পোকার কীড়া বেশ শক্তিশালী ৪০-৫০ মিমি লম্বা হয়। এ পোকা চারা গাছ কেটে দেয় এবং আলুতে ছিদ্র করে এজন্য আলুর ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাটুই পোকার প্রকোপ বেশি না হলে কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উলটপালট করে কীড়া খুঁজে বের করে মেরে ফেলতে হবে। এছাড়াও প্রতি লিটার পানির সাথে ডারসবান ২০ ইসি ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটি ভিজিয়ে ৩০-৪০ দিন পর স্প্রে করতে হবে। আলুর সুতলি পোকা ও আলু উৎপাদনে বাধাগ্রস্ত করে। এ পোকা দেখতে ছোট, ঝালরযুক্ত, সরু ডানা বিশিষ্ট ধূসর বাদামি রঙের হয়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গ পোকা সাদাটে বা হাল্কা গোলাপি বর্ণের এবং ১৫-২০ মিমি লম্বা হয়। এ পোকা আলুর মধ্যে লম্বা সুড়ঙ্গ করে আলুর ক্ষতি করে থাকে। কৃষকের বাড়িতে রাখা আলু এ পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দমন
বাড়িতে রাখা আলুতে শুকনা বালি, ছাই, তুষ অথবা কাঠের গুঁড়ার পাতলা স্তর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। যাতে পোকা আলুর সংস্পর্শে না আসে। আলু সংরক্ষণের পূর্বে সুতলী পোকায় খাওয়া আলু ফেলে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

আলু পরিণত হলে আলু গাছের কান্ড হেলে পড়ে এবং নিচের দিকের পাতা হলুদ হতে থাকে। আলু সংরক্ষণ করতে হলে অবশ্যই পরিপক্বতা লাভ করার পর ফসল সংগ্রহ করতে হবে। উচ্চফলনশীল জাতে ৮০-১০০ দিন লাগে পরিপক্বতা আসতে। দেশি জাতে সময় আরো বেশি লাগে। বাংলাদেশে উচ্চফলনশীল জাতের হেক্টরপ্রতি ফলন ১৩-১৪ টন এবং দেশি জাতে ৭-৮ টন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করলে উচ্চফলনশীল জাতে ২০ টনের অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব।

কলার বিটল পোকার সমন্বিত দমন পদ্ধতি

দমন ব্যবস্থাপনা:

কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকা সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব:

ক) পর্যায়ক্রমিক ফসলের চাষ: যে সমস্ত বাগানে পোকার আক্রমণ হার অত্যন্ত বেশী সেখানে পরবর্তী বছর জমি উত্তমরুপে চাষ করে অন্য ফসল আবাদ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় বছর উক্ত জমিতে পুনরায় কলা চাষ করা যেতে পারে।

খ) পলিথিন ব্যাগিং: কলার মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে ও ছড়িতে কলা বের হওয়ার পূর্বেই ১০৫ সে:মি: লম্বা ও ৭৫সে:মি: প্রস্থের দু'মুখ খোলা একটি পলিথিন ব্যাগের একমুখ মোচার ভিতর ঢুকিয়ে বেঁধে দিতে হবে, অন্য মুখ খোলা রাখতে হবে। বাতাস চলাচলের জন্য পলিথিন ব্যাগটিতে ২০-৩০টি ছোট ছোট ছিদ্র রাখা বাঞ্ছনীয়। পলিথিন ব্যাগিং দ্বারা এ পোকা দমন অত্যন্ত কার্যকরী ও নিরাপদ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

গ) কীটনাশক দ্বারা পোকা দমন: মোচা বের হওয়ার ৫দিন আগে একবার, মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে একবার, ছড়িতে প্রথম কলা বের হওয়ার পর একবার এবং সম্পূর্ণ কলা বের হওয়ার পর আরো একবার, মোট চারবার অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করলে এই পোকা দমন সম্ভব। কীটনাশক, ডায়াজিনন ৬০ইসি (প্রতি লিটার পানিতে ২ মি:লি) বা সেভিন ৮৫ ডাব্লিওপি (প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম) বা মিপসিন ৭৫ ডাব্লিও পি (প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম) স্প্রে করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণের লেসনশীট

প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ : কৃষক পর্যায়ে ধানের বীজ সংরক্ষণ কৌশল, বাধাকপি উৎপাদনে কেঁচো সারের ব্যবহার, মুগডালের সমন্বিত আগাছা দমন ব্যবস্থাপনা, টমেটো ও বেগুনের চারা, ঢলে পড়া রোগে করনীয়, নভেম্বর মাসে আখ চাষে করনীয়।

পক্ষঃ নভেম্বর/২০২১, ৩য় পক্ষ। **তারিখ : :** ১৫/১১/২০২১ খ্রিঃ ।

আয়োজনে ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দশমিনা, পটুয়াখালী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
দশমিনা, পটুয়াখালী।

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ সিডিউল।

০১. **অর্থ বছর** : ২০২১-২০২২ খ্রিঃ।

০২. **পক্ষ** নভেম্বর/২০২১, ৩য় পক্ষ ।

০৩. **তারিখ** : ১৫/১১/২০২১ খ্রিঃ ।

০৪. **প্রশিক্ষণেরবিষয়** : কৃষক পর্যায়ে ধানের বীজ সংরক্ষণ কৌশল, বাধাকপি উৎপাদনে কেঁচো সারের ব্যবহার, মুগডালের সমন্বিত আগাছা দমন ব্যবস্থাপনা, টমেটো ও বেগুনের চারা, ঢলে পড়া রোগে করনীয়, নভেম্বর মাসে আখ চাষে করনীয়।

০৫. **প্রশিক্ষণেঅংশগ্রহণকারী** : ১৬ জন।

০৬. **প্রশিক্ষণেরধরণ** : লেকচারভিত্তিক ও ব্যবহারিক।

০৭. **প্রশিক্ষণের ভেন্যু** : উপজেলা কৃষি অফিসারের প্রশিক্ষণ রুম।

০৮. **প্রশিক্ষণ কারিকুলাম** :

ক্র. নং	সময়	আলোচনারবিষয়	ফ্যাসিলিটেটর
০১	১০:০০-১১:০০	কৃষক পর্যায়ে ধানের বীজ সংরক্ষণ কৌশল	মোঃ নাহিদ হাসান কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার দশমিনা, পটুয়াখালী।
০২	১১:০০-১২:০০	মুগডালের সমন্বিত আগাছা দমন ব্যবস্থাপনা	মোঃ জাফর আহমেদ উপজেলা কৃষি অফিসার, দশমিনা, পটুয়াখালী।
০৩	১২:০০-১:০০	বাধাকপি উৎপাদনে কেঁচো সারের ব্যবহার	মোঃ নাহিদ হাসান কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার দশমিনা, পটুয়াখালী।
০৪	১:০০-২.৩০	নামাজ ও খাবারের বিরতি	-
০৫	২:৩০-৩:৩০	টমেটো ও বেগুনের চারা ঢলে পড়া রোগে করনীয়	মোঃ জাফর আহমেদ উপজেলা কৃষি অফিসার, দশমিনা, পটুয়াখালী।
০৬	৩.৩০-৪.৩০	নভেম্বর মাসে আখ চাষে করনীয়	মোঃ নাহিদ হাসান কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার দশমিনা, পটুয়াখালী।

মোঃ জাফর আহমেদ
উপজেলা কৃষি অফিসার
দশমিনা, পটুয়াখালী।

কৃষক পর্যায়ে ধানের বীজ সংরক্ষণ কৌশল

ক্ষেতে অবস্থিত ফসল থেকে কাঙ্খিত গাছগুলো একটি একটি করে বাছাই করে বা ক্ষেতের শস্যের অংশ বিশেষকে বীজের জন্য চিহ্নিত/বাছাই করতে হবে। ক্ষেতের বেশি সবল ও সুস্থ অংশ বাছাই করার জন্য মাঠের অংশ বিশেষ শনাক্ত করা উচিত।

ক্ষেতে অবস্থিত কাক্সিক্ষত প্রতিটি গাছ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সাধ্যমতো ক্ষেতের কিনারা বাদ দিয়ে ভেতর থেকে এমন গাছ বাছাই করতে হবে যেগুলো সঠিক জাতের এবং বেশ পুষ্ট ও সুস্থ হয়।

সহজভাবে শনাক্তকরণের জন্য বাছাই করা প্রতিটি গাছ কাঠি দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। বীজ সংগ্রহের জন্য পরিপক্ব অবস্থায় প্রথম বাছাই করা গাছ কাটতে হবে এবং পরে মাঠের অবশিষ্ট ফসল কাটা উত্তম।

বীজের জন্য কেটে নেয়া গাছগুলো আলাদাভাবে রাখতে হবে যাতে এগুলো একই ফসলের সাথে অন্যগাছের দানা মিশে না যায়। বীজের গুণাগুণ নষ্ট হওয়া রোধের জন্য বাছাই করা গাছগুলো ভালোভাবে শুকাতে হবে।

বীজের জন্য ক্ষেতের অংশ বিশেষ বাছাই পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শস্যক্ষেতের মাঝ থেকে অথবা যতদূর সম্ভব ভেতর থেকে অংশ বিশেষ নির্বাচন করা দরকার।সংরক্ষিত এলাকার প্রতি নিয়মিত বিশেষ দৃষ্টিসহ উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি গ্রহণ করার পর, ফসল পাকার সময় গাছের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার যাতে বিজাতীয় গাছ কেটে সরিয়ে ফেলা যায়।

জমিতে ধান পাকলে বা ধান গাছ শুকিয়ে গেলে ধান কাটায় বিলম্ব করা মোটেই উচিত নয়। এতে কিছু ধান ঝরে পড়তে পারে এবং ধানের শীষকাটা লেদাপোকা এবং পশুপাখির আক্রমণ হতে পারে। শীষের অগ্রভাগ থেকে ধান পাকা শুরু হয়।

কাছে গিয়ে সারা ক্ষেতের ধান পাকা পরীক্ষা করতে হবে। শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ এবং শীষের নিচের শতকরা ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে।

ধান মাড়াই করার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা বেছে নেয়া দরকার। কাঁচাখোলার ওপর সরাসরি ধান মাড়াই না করে চাটাই বা হোগলার ওপর ধান রেখে পা দিয়ে বা উপযুক্ত মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে মাড়াই করা দরকার। অথবা ধানের আটি তিন বাড়ি দিয়ে যে পুষ্ট-ভারী ধান পাওয়া যাবে শুধুমাত্র সেগুলোকেই কুলা দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার ও শুকানোর পরে বীজ হিসাবে নেয়া যাবে।

এভাবে ধান মাড়াই করলে ধানের ক্ষতি কম হয় এবং ধান পরিষ্কার থাকে। বীজ ধান এভাবে মাড়াই করার পর অন্তত পক্ষে ৪-৫ বার রোদে শুকিয়ে নেয়া দরকার। বাদলা দিন থাকলে ধান মাড়াই করা ও শুকানো কষ্টকর হয়। সেজন্য শীষ কেটে ছোট ছোট আঁটি করে ঘরের ভেতর ঝুলিয়ে দিয়ে শুকানো যায়। না হলে ধানের বীজ গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

বীজ সংরক্ষণ : বীজ ধান ঠিকমতো সংরক্ষণ না করলে একদিকে কীটপতঙ্গ ও ইঁদুর নষ্ট করে, অপরদিকে গজানোর ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বীজ ধান থেকে আশানুরূপ সংখ্যক চারা পাওয়া যায় না। বীজ ধান কাটা ও মাড়াইয়ের পর ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো মেনে চলা প্রয়োজন।

বীজ সংরক্ষণের আগে পর পর কয়েকবার রোদে অথবা প্রয়োজনে ড্রায়ারের সাহায্যে ভলোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে যেন বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে থাকে। দাঁত দিয়ে বীজ কাটলে কট কট শব্দ করে তাহলে বুঝতে হবে বীজ ঠিকমতো শুকিয়েছে।

বড় বড় পুষ্ট ধান বাছাই কবে নিতে হবে। কুলা দিয়ে ঝেড়ে ১.৭৫-২.৫০ মিলিমিটার (জাতের ওপর নির্ভর করে) ছিদ্র বিশিষ্ট তারের দড়ির ছাঁকনি দিয়ে বাছাই করে নেয়া যেতে পারে। যে পাত্রে বীজ রাখা হবে তাতে যেন কোনো ছিদ্র না থাকে। বীজ রাখার জন্য তেলের ড্রামে কিংবা বিস্কুট বা কেরোসিনের টিন প্রভৃতি ধাতব পাত্র ব্যবহার করা ভালো।

ধাতব ব্যবহার করা সম্ভব না হলে মাটির মটকা, কলস, প্লাস্টিক ড্রাম বা মোট পলিথিনের থলি ব্যবহার করা যেতে পারে। পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে। মাটির পাত্র হলে পাত্রের বাইরের গায়ে আলকাতরা দিয়ে দুইবার প্রলেপ দিতে হবে।

রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। পাত্রটি সম্পূর্ণ বীজ দিয়ে ভরাট করে রাখতে হবে। যদি বীজের পরিমাণ কম হয় তবে বীজের ওপর কাগজ বিছিয়ে তার ওপর শুকানো বালি অথবা ছাই দিয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করতে হবে।

এবার পাত্রের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। বীজের পাত্র মাচায় রাখা ভালো যাতে পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে। গুদামে বায়ু চলাচলের পার্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বীজ কখনও সেঁতসেঁতে জায়গায় সংরক্ষণ করা ঠিক নয়। সংরক্ষণ করা বীজ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা দরকার যাতে কোনো প্রকার পোকামাকড় বা ইঁদুর ক্ষতি করতে না পারে।দরকার হলে বীজ বের করে মাঝে মধ্যে শুকিয়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে পরবর্তী মৌসুমে বীজ ব্যবহার, বিক্রয় বা বিতরণের আগে অবশ্যই বীজ গজানোর পরীক্ষা করা দরকার। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ৮০টি সুস্থ-স্বাভাবিক চারা গজিয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

মুগডালের সমন্বিত আগাছা দমন ব্যবস্থাপনা

মুগডালের বীজ উৎপাদনে আগাছা অন্যতম বড় সমস্যা। সমন্বিতভাবে আগাছা দমন করে সহজেই মুগডালের বীজ উৎপাদন করা যাবে। আসুন জেনে নেয়া যাক, সমন্বিতভাবে আগাছা দমনে মুগডালের বীজ উৎপাদন কৌশল গুলো।

বাংলাদেশে সোনামুগ, অস্ট্রেলিয়ানমুগ ও বারী জাতের মুগডালের চাষ হয়। তবে সবচেয়ে বেশি চাষ হয় বারী জাতের মুগডাল।বাংলাদেশের উৎপাদিত এ মুগডাল জাপানে সালাদ হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয় বলে জানা গেছে। সমন্বিত আগাছা দমনের মাধ্যমে মুগডালের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন পদ্ধুতি না জানলে ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন চাষিরা।

মুগডাল ফসল উৎপাদনে আগাছার উপদ্রব একটি মারাত্মক সমস্যা। বিশেষতঃ খরিপ-১ মৌসুমে আগাছা দমন দুরূহ হয়ে পড়ে। মুগডালের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে বীজ বপনপূর্বক আগাছানাশক প্রয়োগ এবং এর সাথে বীজ বপন পরবর্তী আগাছা দমন খুবই কার্যকরী।

জমি চাষের এক সপ্তাহ পূর্বে আগাছানাশক গ্লাইকোফোসেট প্রতি লিটার পানিতে ৭.৫ মিলিলিটার হারে ৫ শতক জমির জন্য ১০ লিটার মিশ্রণ প্রয়োগ করে পরবর্তীতে চারা গজানোর ২০ দিন পর একবার নিড়ানী দ্বারা আগাছা পরিস্কার করলে ১.৫৭ টন/হেক্টর মানসম্পন্ন (শতকরা ৮০ ভাগের অধিক গজানো ক্ষমতাসম্পন্ন) মুগডালের বীজ পাওয়া যায়। আগাছানাশক গ্লাইকোফোসেট সব ধরনের আগাছা দমনের জন্য কার্যকরী।

সমন্বিত আগাছা দমন প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষক একদিকে মুগডালের অধিক বীজ পাবে, অন্যদিকে বীজের উৎপাদন খরচ কম পড়বে। প্রচলিত হাতদ্বারা আগাছা দমন পদ্ধতিতে অনেক কৃষি শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে, তাছাড়া সময়মত কৃষি শ্রমিক পাওয়াও যায় না।

সমন্বিত আগাছা দমন প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষক স্বল্প খরচে ও সঠিক সময়ে আগাছা দমন করতে পারে বিধায় মানসম্পন্ন মুগডালের অধিক বীজ উৎপাদন করতে পারে। এজন্য কৃষকেরা অধিক আয় করতে পারে। এই প্রযুক্তিতে মোট লাভ (Gross Margin) ১,৩৪,৮৫০ টাকা/হেক্টর এবং প্রান্তিক আয়-ব্যয়ের অনুপাত (Marginal Benefit Cost Ratio) ৫.৩২।

বাধাকপি উৎপাদনে কেঁচো সারের ব্যবহার

কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্টের গুরুত্ব

বিজ্ঞানী চালর্স ডারউইন সর্বপ্রথম কেঁচোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সবাইকে অবগত করান। তিনি বলেন কেঁচো ভূমির অন্ত্র এবং পৃথিবীর বুকে উর্বর মাটি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে, যার ওপর ফসল উৎপাদন করি। এ অতি সাধারণ, ক্ষুদ্র প্রাণীটি পচনশীল জৈবপদার্থ থেকে সোনা ফলাতে পারে, কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্টে রূপান্তরিত করে। আহার পর্বের পর যে পাচ্য পদার্থ মলরূপে নির্গমন হয় তাকে কাস্ট বলে। এ কাস্টের ভেতর জীবাণু সংখ্যা এবং তার কার্যকলাপ বাড়ার কারণে মাটির উর্বরতা বাড়ে। দেখা গেছে, পারিপার্শ্বিক মাটির তুলনায় কাস্টের মধ্যে জীবাণু সংখ্যা প্রায় হাজার গুণ বেশি। এ কাস্টের ওপরে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক উৎপাদনকারী ব্যাক্টেরিয়া জীবাণু বেশি থাকায় মাটির উর্বরতাও বাড়ে। কাস্টের কারণে মাটি থেকে গাছে ৬ শতাংশ নাইট্রোজেন এবং ১৫-৩০ শতাংশ ফসফরাস যোগ হতে দেখা গেছে। এছাড়াও অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্য উপাদান ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম গাছ বেশি পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে। কেঁচোর উপস্থিতিতে জৈবপদার্থের কার্বন ও নাইট্রোজেন অনুপাত প্রায় ২০:১ এর কাছাকাছি হয়। এ অনুপাতে গাছ সহজেই কম্পোস্ট থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

কেঁচোর বৈশিষ্ট্য

কেঁচোর সার তৈরি করতে নির্দিষ্ট প্রজাতির কেঁচো বেছে নেয়ার জন্য তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে নেয়া আবশ্যক। শীত ও গ্রীষ্ম উভয় আবহাওয়াতে বেঁচে থাকার ক্ষমতা; সব রকম জৈববস্তু থেকে খাবার গ্রহণ করার সামর্থ্য; কেঁচো যেন রাক্ষুসে প্রকৃতির হয়, অর্থাৎ প্রচুর আহার করার ক্ষমতা থাকতে হবে; অন্যান্য প্রজাতির কেঁচোর সাথে মিলেমিশে বাস করা; জৈব দ্রব্য পাওয়ার সাথে সাথে বা অল্প সময়ের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠা এবং সেখান থেকে খাবার সংগ্রহ করা; রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এবং প্রতিকূল অবস্থানে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়া; দ্রুততার সাথে বংশবিস্তার করা এবং শারীরিক বৃদ্ধি ঘটানো।

স্থানীয় কেঁচো সংগ্রহের উপায়

এমন মাটি শনাক্ত করতে হবে যেখানে কেঁচো দৃশ্যমান। ৫০০ গ্রাম গুড় এবং ৫০০ গ্রাম তাজা গোবর ২ লিটার পানিতে দ্রবীভূত করে ১ মিটার দ্ধ ১ মিটার এলাকায় মাটির উপরিতলে ভালোভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। খড়ের ডেলা এবং পুরনো চটের থলি দিয়ে জায়গাটা ঢেকে দিতে হবে। ২০ থেকে ৩০ দিন ক্রমাগত পানি ছিটিয়ে যেতে হবে। এ

জায়গাতেই একসাথে বহু কেঁচোর বাচ্চা জন্ম হবে যাদের সহজেই সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা যাবে। এমনকি পচা কলার গাছের খোল থেকেও স্থানীয় লাল কেঁচো সংগ্রহ করা যায়।

গর্ত বানানো ও সার তৈরি করা

প্রয়োজনানুযায়ী গর্ত তৈরি করে নেয়া যেতে পারে বাড়ির উঠোনে অথবা বাগানে বা মাঠে। একটি অথবা দুটি গর্ত করা যেতে পারে বা ইঁট ও চুন-সুরকি দিয়ে যে কোনো মাপের ট্যাংক, পানি যাওয়ার জায়গাসহ তৈরি করে নেয়া যেতে পারে। ২ মিটার দ্ধ ১ মিটার দ্ধ ০.৭৫ মিটার হচ্ছে এ কাজের জন্য আদর্শ। জৈব ও কৃষির র্জ্যরে ওপর নির্ভর করবে গর্তের মাপ। কেঁচোগুলো পিঁপড়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য গর্তের মাঝ-বরাবর অস্থায়ী প্রাচীরে পানি জমিয়ে রাখা যায়। চারটি প্রকোষ্ঠযুক্ত গর্ত-ট্যাংক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ জৈবসারের প্রকোষ্ঠ থেকে প্রক্রিয়াকরণের আগের বর্জ্য প্রকোষ্ঠে কেঁচোদের যাতায়াতের সুবিধা করার জন্যই চারটি প্রকোষ্ঠযুক্ত গর্ত বা ট্যাঙ্ক তৈরি করা হয়।

উপকরণ

প্রাণীর মল-গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, ছাগল-ভেড়ার মল। এগুলোর মধ্যে গোবর উৎকৃষ্ট; মুরগির বিষ্ঠায় প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফেট থাকে যা পরিমাণে বেশি হলে কেঁচোর ক্ষতি হতে পারে। তাই খড়, মাটি বা গোবরের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা ভালো। কৃষি বর্জ্য-ফসল কাটার পর পড়ে থাকা ফসলের দেহাংশ যেমন- ধান ও গমের খড়, মুগ, কলাই, সরিষার গমের খোসা, তুষ, কা-, ভুসি, সবজির খোসা, লতাপাতা, আখের ছোবড়া; গোবর গ্যাসের পড় থাকা তলানি বা স্লারি; শহরের আবর্জনা এবং শিল্পজাত বর্জ্য যেমন- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বর্জ্য। যেসব বস্তু ব্যবহার করা উচিত নয়, তাহলো-পেঁয়াজের খোসা, শুকনোপাতা, মরিচ, মসলা এবং অম্ল বা এসিড সৃষ্টিকারী বর্জ্য টমেটো, তেঁতুল, লেবু, কাঁচা বা রান্না করা মাছ মাংসের অবশিষ্টাংশ। এছাড়া অজৈব পদার্থ পাথর, ইটের টুকরা, বালি, পলিথিন।

স্থান নির্বাচন ও প্রস্তুত প্রণালি

সার তৈরি করতে প্রথমে ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গা বাছতে হবে, যেখানে সরাসরি সূর্যালোক পড়বে না এবং বাতাস চলাচল করে। ওপরে একটি ছাউনি দিতে হবে। মাটিরপাত্র, কাঠেরবাক্স, সিমেন্টের রিং বা পাত্র, পাকা চৌবাচ্চা বা মাটির ওপরের কেঁচোসার প্রস্তুত করা যায়। লম্বা ও চওড়া যাই হোক না কেন উচ্চতা ৩০.৪৮ সে.মি.-৩.৮১ সে.মি. (১-১.৫ ফুট) হতে হবে। পাত্রের তলদেশে ছিদ্র থাকতে হবে যাতে কোনোভাবেই পাত্রের মধ্যে পানি না জমে। প্রথমে চৌবাচ্চা বা পাত্রের তলদেশে ৩ ইঞ্চি বা ৭.৫ সেন্টিমিটার ইঁটের টুকরা, পাথরের কুচি দিতে হবে। তার ওপরে ২.৫৪ সে.মি. (১ ইঞ্চি) বালির আস্তরন দেয়া হয় যাতে পানি জমতে না পারে। বালির ওপর গোটা খড় বা সহজে পচবে এরকম জৈব বস্তু বিছিয়ে বিছানার মতো তৈরি করতে হয়। এরপর আংশিক পচা জৈবদ্রব্য (খাবার) ছায়াতে ছড়িয়ে ঠা-া করে বিছানার ওপর বিছিয়ে দিতে হবে। খাবারে পানির পরিমাণ কম থাকলে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে যেন ৫০-৬০ শতাংশ পানি থাকে। খাবারের ওপরে প্রাপ্ত বয়স্ক কেঁচো গড়ে কেজি প্রতি ১০টি করে ছেড়ে দিতে হবে। কেঁচোগুলো অল্প কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর এক মিনিটের মধ্যেই খাবারের ভেতরে চলে যাবে। এরপর ভেজা চটের বস্তা দিয়ে জৈব দ্রব্য পুরোপুরি ঢেকে দেয়া উচিত। বস্তার পরিবর্তে নারিকেল পাতা দিয়েও ঢাকা যেতে পারে। মাঝে মাঝে হালকা পানির ছিটা দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে অতিরিক্ত পানি যেন না দেয়া হয়। এভাবে ২ মাস রেখে দেয়ার পর কম্পোস্ট সার তৈরি হয়ে যাবে। জৈববস্তুর ওপরের স্তরে কালচে বাদামি রঙের, চায়ের মতো দানা ছড়িয়ে থাকতে দেখলে ধরে নেয়া হয় সার তৈরি হয়ে গেছে। এ সময়ে কোনো রকম দুর্গন্ধ থাকে না। কম্পোস্ট তৈরি করার পাত্রে খাবার দেয়ার আগে জৈববস্তু, গোবর, মাটি ও খামারজাত সার নির্দিষ্ট অনুপাত (৬:৩:০.৫:০.৫) অর্থাৎ জৈব আবর্জনা ৬ ভাগ, কাঁচা গোবর ৩ ভাগ, মাটি ১/২ ভাগ এবং খামার জাত সার ১/২ ভাগ, মিশিয়ে আংশিক পচনের জন্য স্তূপাকারে ১৫-২০ দিন রেখে দিতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর ওই মিশ্রিত পদার্থকে কেঁচোর খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে একটি ১ মিটার লম্বা, ১ মিটার চওড়া ও ৩ সেন্টিমিটার গভীর আয়তনের গর্তের জন্য ৪০ কিলোগ্রাম খাবারের প্রয়োজন হয়। এ রকম একটি গর্তে এক হাজার কেঁচো প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম দিকে কম্পোস্ট হতে সময় বেশি লাগে (৬০-৭০ দিন)। পরে মাত্র ৪০ দিনেই সম্পন্ন হয়। কারণ ব্যাক্টেরিয়া ও কেঁচো উভয়েরই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। তথ্য অনুসারে ১ কেজি বা ১০০০টি কেঁচো, ৬০-৭০ দিনে ১০ কেজি কাস্ট বা কম্পোস্ট তৈরি করতে পারে। এক কেজি কেঁচো দিনে খাবার হিসেবে ৫ কেজি সবুজসার খেতে পারে। তার জন্য ৪০-৫০ শতাংশ আর্দ্রতা বজায় রাখা আবশ্যক। প্রায় ৮০০-১০০০ কেঁচোর ওজন হয় ১ কেজি। এই পরিমাণ কেঁচো সপ্তাহে ২০০০-৫০০০টি ডিম বা গুটি দেয়। পূর্ণাঙ্গ কেঁচোর জন্ম হয় ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ১ কেজি কাঁচা গোবর থেকে প্রায় ৫০০ গ্রাম কম্পোস্ট পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য কৃষিজ বর্জ্যে ক্ষেত্রে কেজি কাঁচামাল হতে ২৫০ গ্রাম কেঁচো সার পাওয়া যায়।

সার প্রস্তুতকরণ

যখন পদার্থগুলো সামান্য ঝুরঝুরে হয়ে যাবে এবং সারের রঙ গাঢ় বাদামি হয়ে যাবে তখনই সার প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। দানাদার, কালো, হালকা এবং বোদযুক্ত হবে; ৬০-৯০ দিনের মধ্যেই সার প্রস্তুত সম্পন্ন হবে। ওপরের বেডে কেঁচোর উপস্থিতিতেই তা বোঝা যাবে; সার থেকে কেঁচোগুলোকে আলাদা করার জন্য বেড খালি করার ২-৩ দিন আগে পানি দেয়া বন্ধ করতে হবে। এর ফলে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কেঁচো নিচে চলে যাবে;

ঝাঁঝরি বা চালুনি দিয়েও কেঁচোদের আলাদা করা যায়। কেঁচো এবং সামান্য পুরু পদার্থ যা ঝাঁঝরির ওপরে থেকে যাবে তাকে আবার গর্তে ফেলে দিতে হবে যেখানে পুনরায় পদ্ধতিটি শুরু হবে। সারের গন্ধ মাটির মতো। যে কোনো খারাপ গন্ধ এটাই প্রমাণ করে পচন প্রক্রিয়া শেষ হয়নি এবং ব্যাক্টিরিয়ার কার্য-ক্রিয়া চালু আছে। ছাতা ধরা বা বাসিগন্ধের মানে নাইট্রোজেন বেরিয়ে যাচ্ছে। যদি এমন ঘটে তাহলে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং আরও বেশি করে তন্তু জাতীয় পদার্থ যোগ করতে হবে এবং শুকনা রাখতে হবে। এরপরে ব্যবহারের উপযোগী সারকে ছেঁকে নিয়ে প্যাকেট করতে হবে;

দুই বা চার প্রকোষ্ঠযুক্ত ব্যবস্থায় প্রথম প্রকোষ্ঠে পানি দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে যাতে কেঁচোগুলো নিজে থেকেই এক প্রকোষ্ঠ থেকে অন্য প্রকোষ্ঠে চলে যায় যেখানে উপযুক্ত পরিবেশ নিয়মিতভাবে রক্ষা করা হয় এবং ফসল উৎপাদনও নিয়মিত হতে থাকে।

সতর্কতা

পিঁপড়া, উঁইপোকা, তেলাপোকা, গোবরাপোকা, চিকা, মুরগি ও বিভিন্ন পাখি কেঁচোর শত্রু। এগুলো কোনো কীটনাশক দিয়ে মারা যাবে না। তবে হাউসের চারদিকে কীটনাশক দেয়া যাবে। ব্যবহৃত গোবরের সঙ্গে ছাই, বালু, ভাঙা কাঁচ এসব রাখা যাবে না। মুরগি ও পাখির আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য হাউসের ওপর ঢাকনা দিয়ে রাখতে হবে। কেঁচোকে জীবিত ও সক্রিয় রাখতে হাউসে বেশি পানি দেয়া যাবে না। চালনি দিয়ে চালার সময় হাউসে নির্দিষ্ট জাত ছাড়া অন্য জাতের কেঁচো থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে। ট্যাংক-প্রকোষ্ঠ-রিংয়ের উচ্চতা কোনোক্রমেই আড়াই ফিটের অধিক করা যাবে না। উচ্চতা বেশি হলে অক্সিজেনের অভাবে কেঁচো নিচে যেতে চাবে না এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা দিবে।

আয়-ব্যয় হিসাব

মূলত রিং পদ্ধতিতে কেঁচোকম্পোস্ট সার উৎপাদন করে থাকেন। প্রতিটি রিংয়ের উচ্চতা ৩০.৪৮ সে.মি. (১২ ইঞ্চি) এবং ব্যাস ৭৬.২ সে.মি. (৩০ ইঞ্চি)। প্রতিটি রিংয়ে

৬০-৭০ কেজি গোবরে আধা কেজি কেঁচো দেয়া হয়। আবার অনেক সময় একটি রিংয়ের ওপর আরেকটি রিং বসিয়ে দেয়া হয়। এতে গোবর ও কেঁচো দ্বিগুণ হারে লাগে। প্রতি রিংয়ে রিং বাবদ ২০০ টাকা, গোবর বাবদ ১২০ টাকা এবং কেঁচো বাবদ ২৫০ টাকা খরচ হয়। স্থাপনের ২৫-৩০ দিনের মাথায় বিক্রয়ের উপযোগী কেঁচো সার তৈরি হয়। প্রতিটি রিং হতে ৩০-৩৫ কোজি সার পাওয়া যায়। প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে বিক্রি হয়। ফলে এক মাসে একটি রিং হতে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা এবং প্রায় আধা কেজি কেঁচো ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা দরে বিক্রি হয়। এভাবে ১৭টি রিং থেকে মাসে সাড়ে ১১ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা এবং বছর ঘুরে ১ লাখ ৩০ হাজার থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা আয় হয়। ২৫ শতক আলুর জমিতে রাসায়নিক সারের পাশাপাশি প্রতি শতকে ৩ কেজি হারে কেঁচো সার ব্যবহার করতে হয়। এক শতক জমিতে তিনি ১২০ কেজি ফলন হয়। প্রতিবেশী কৃষকেরা ফলন পায় ১০০ কেজির কাছাকাছি। শুধু তাই নয় তার জমিতে রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব কম হয়। কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন স্থানে কৃষি তথ্য সার্ভিস নির্মিত ভার্মিকম্পোস্টের ওপর সিনেমা শো আয়োজন করে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পশ্চিম ধনতলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের অনেক মহিলা সদস্যসহ গ্রামের অনেকেই এখন কেঁচোকম্পোস্ট সার উৎপাদন করছে। কেঁচোসার উৎপাদন-বিক্রয় করে গ্রামের বেকার যুবক-যুবতিদের সহজেই স্বনির্ভর আয়ের সংস্থান করতে পারেন।

কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্টের ব্যবহারের মাত্রা ও ফলনে প্রভাব

ভার্মিকম্পোস্ট সব প্রকার ফসলে যে কোনো সময়ে ব্যবহার করা যায়। সবজি এবং কৃষি জমিতে ৩-৪ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টরে ও ফল গাছে গাছ প্রতি ৫-১০ কেজি হারে ব্যবহার করা হয়। ফুল বাগানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের পরিমাণ ৫০০ থেকে সাড়ে ৭০০ কেজি এক হেক্টর জমিতে। মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কেঁচো সার ব্যবহারে মাঠ ফসলে ফলন শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সবজিতে ফলন বৃদ্ধিসহ গুণগতমান ও স্বাদ বাড়ে। এমনকি ফল না ধরা অনেক পুরনো ফল গাছে নতুন করে ফল ধরাসহ ফলদ বৃক্ষে দুইগুণ অবধি ফলন বেড়েছে। জমির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা বজায় রাখার জন্য জৈব সার ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন এ ব্যাপারে। তাই ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন ও তার ব্যবহার এক মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে চলেছে আগামী দিনগুলোতে।

টমেটো ও বেগুনের চারা ঢলে পড়া রোগে করনীয়

ফিউজারিয়াম ঢলে পড়া (Fusarium wilt) : রোগের কারণ ও লক্ষণ : ফিউজারিয়াম অক্সিস্পোরাম এফ. এসপি. লাইকোপারসিসি (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) নামক ছত্রাকের আক্রমণে হয়। চারা গাছের বয়স্ক পাতাগুলো নিচের দিকে বেঁকে যায় ও ঢলে পড়ে। ধীরে ধীরে পুরো গাছই নেতিয়ে পড়ে ও মরে যায়। গাছের কান্ডে ও শিকড়ে বাদামি দাগ পড়ে। গাছে প্রথমে কান্ডের এক পাশের শাখার পাতাগুলো হলদে হয়ে আসে এবং পরে অন্যান্য অংশ হলুদ হয়ে যায়। রোগ বৃদ্ধি পেলে সব পাতাই হলুদ হয়ে যায় এবং অবশেষে সম্পূর্ণ শাখাটি মরে যায়। এভাবে পুরো গাছটাই ধীরে ধীরে মরে যায়। সম্ভব হলে ফরমালিন দিয়ে মাটি শোধন করতে হবে; নীরোগ বীজতলার চারা লাগাতে হবে; আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করতে হবে; জমিতে চুন প্রয়োগ করতে হবে; জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে পটাশ সার প্রয়োগ করলে রোগ অনেক কম হয়; শিকড় গিট কৃমি দমন করতে হবে কারণ এটি ছত্রাকের অনুপ্রবেশে সাহায্য করে; রোগের আক্রমণ দেখা দিলে ব্যভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা কিউপ্রাভিট প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে চারার গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।

ঢলে পড়া (Bacterial wilt): রোগের কারণ ও বিস্তার : রালসটোনিয়া সোলানেসিয়ারাম (Ralstonia solanacearum) নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হয়। গাছের পরিত্যক্ত অংশ, মাটি ও বিকল্প পোষকে এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে। সেচের পানি ও মাঠে ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। উচ্চ তাপমাত্রা (২৮-৩২০ সেলসিয়াস) ও অধিক আর্দ্রতায় এ রোগ দ্রুত ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার : গাছ বৃদ্ধির যে কোনো সময় এ রোগ হতে পারে এবং ব্যাপক ক্ষতি করে। আক্রান্ত গাছের পাতা ও ডাঁটা খুব দ্রুত ঢলে পড়ে এবং গাছ মরে যায়। গাছ মরার পূর্ব পর্যন্ত পাতায় কোনো প্রকার দাগ পড়ে না। মাটির ওপরে আক্রান্ত গাছের গোড়া থেকে সাদা রঙের শিকড় বের হয়। রোগের প্রারম্ভে কান্ডের নিম্নাংশ চিরলে এর মজ্জার মধ্যে কালো রঙের দাগ দেখা যায় এবং চাপ দিলে তা থেকে ধূসর বর্ণের তরল আঠাল পদার্থ বের হয়ে আসে। এ তরল পদার্থে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া থাকে। তাছাড়া আক্রান্ত গাছের গোড়ার দিকের কা- কেটে পরিষ্কার গ্লাসে পানিতে ডুবিয়ে রাখলে সাদা সুতার মতো ব্যাকটেরিয়াল উজ বের হয়ে আসতে দেখা যায়। রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করতে হবে; বুনো বেগুন গাছের কান্ডের সাথে কাক্সিক্ষত জাতের টমেটোর জোড় কলম করতে হবে; শস্য পর্যায়ে বাদাম, সরিষা, ভুট্টা ফসল চাষ করতে হবে; রোগাক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র মাটিসহ তুলে ধ্বংস করতে হবে; টমেটোর জমি স্যাঁতস্যাঁতে রাখা যাবে না; হেক্টর প্রতি ২০ কেজি স্টেবল ব্লিচিং পাউডার শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে; স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট (অক্সিটেট্রাসাইক্লিন) ২০ পিপিএম অথবা ক্লোসিন এজি ১০ এসপি ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৪-৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

নভেম্বর মাসে আখ চাষে করনীয়

১. ইক্ষু জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম : বিএসআরআই পরিবর্তিত জলবায়ুগত অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন কৃষি-পরিবেশ অঞ্চলে চাষের জন্য ৪৫টি ইক্ষু জাত উদ্ভাবন করেছে। ওই ইক্ষু জাতগুলো দেশের চিনিকল এলাকার প্রায় ৯৯% এবং চিনিকল বহির্ভূত গুড় এলাকায় প্রায় ৫৭% এলাকাজুড়ে চাষাবাদ হচ্ছে। বিএসআরআই উদ্ভাবিত ইক্ষু জাতগুলোর গড় ইক্ষুর ফলন হেক্টরপ্রতি ১০০ টনের বেশি এবং আখে চিনির পরিমাণ ও ১২% এর উর্ধ্বে। বিএসআরআই আখ ৪১ জাতটি চিনি ছাড়াও গুড়, রস তৈরি এবং চিবিয়ে খাওয়ার জন্য বিশেষ উপযোগী। গড় ফলনও হেক্টরপ্রতি ১৫০ টনের উর্ধ্বে। নিম্ন তাপমাত্রায় ইক্ষুর অংকুরোদগম ভালো হওয়ার জন্য ঠান্ডা সহিষ্ণু ইক্ষু জাতও উদ্ভাবন করা হয়েছে। টিস্যুকালচারের মাধ্যমে পরিবর্তিত জলবায়ুতে চাষের জন্য বিএসআরআই আখ ৪৩ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

খরাপ্রবণ এলাকায় ইক্ষু চাষে করণীয় : খরা সহিষ্ণু ইক্ষু জাত রোপণ, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে ইক্ষু রোপণ সম্পন্ন করা, ২৫-৩০ সে. গভীর নালায় ইক্ষু রোপণ, ইক্ষু রোপণের সময় সুপারিশকৃত মাত্রায় রাসায়নিক ও জৈবসার প্রয়োগ নিশ্চিত করা, ইক্ষু রোপণের সময় পটাশ সারের সুপারিশকৃত মাত্রার অতিরিক্ত হিসেবে হেক্টর প্রতি ৮২ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা, ইক্ষু রোপণের পর পরই ইক্ষুর গোড়ায় ও নালায় ১০-১৫ সেমি. পুরু করে ট্রাস দিয়ে ঢেকে দেয়া, সেচ সুবিধা থাকলে খরার সময় সেচ দেয়া এবং সেচ সুবিধা না থাকলে খরা চলাকালীন ইক্ষুর পাতার দুই-তৃতীয়াংশ অংশ কর্তন করে দেয়া।

বন্যাপ্রবণ এলাকায় ইক্ষু চাষে করণীয় : বন্যা সহিষ্ণু ইক্ষু জাত রোপণ করা, আগাম ইক্ষু রোপণ করা, ইক্ষু রোপণের সময় সুপারিশকৃত মাত্রায় রাসায়নিকও জৈবসার প্রয়োগ নিশ্চিত করা, ১৫ মে এর মধ্যে উপরি সার প্রয়োগ সম্পন্ন করা, ইক্ষু রোপণের পর তিন মাস ইক্ষুর আগাছা দমন ও মালচিং নিশ্চিত করা, জুন/জুলাই/আগস্ট মাসে

ইক্ষুর মরা ও পুরনো পাতা এবং প্রতি ঝাড়ে ৫-৬টি সুস্থ কুশি রেখে অতিরিক্ত কুশি কর্তন করা, ইক্ষুর জমি বন্যায় প্লাবিত হওয়ার আগেই ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দেয়া, জমিতে স্রোতের ফলে ইক্ষুর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে জমির আইল (সীমানা) বরাবর ধৈঞ্চা বপন করা, ইক্ষুর জমি হতে পানি নেমে গেলে যথাসম্ভব দ্রুত ইক্ষু কর্তন ও মাড়াই করা।

জলাবদ্ধতাপ্রবণ এলাকায় ইক্ষু চাষে করণীয়

জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ইক্ষু জাত রোপণ করা, আগাম ইক্ষু রোপণ করা, ইক্ষু রোপণের সময় সুপারিশকৃত মাত্রায় রাসায়নিক ও জৈবসার প্রয়োগ নিশ্চিত করা, ১৫ মের মধ্যে উপরি সার প্রয়োগ করা, ইক্ষু রোপণের পর তিন মাস ইক্ষুর আগাছা দমন ও মালচিং নিশ্চিত করা, ১৫ জুনের মধ্যে ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দেয়া, জুন/জুলাই/আগস্ট মাসে ইক্ষুর মরা ও পুরনো পাতা এবং প্রতি ঝাড়ে ৫-৬টি সুস্থ কুশি রেখে অতিরিক্ত কুশি কর্তন করা, ইক্ষুর জমি জলাবদ্ধতা হওয়ার আগেই ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দিয়ে বেঁধে দেয়া, ইক্ষুর জমি জলাবদ্ধতা অবস্থায় জমিতে উৎপাদিত জলজ উদ্ভিদ (ঘাস) এবং শ্যাওলা দমন করা, ইক্ষুর জমি হতে পানি কমে গেলে যথাসম্ভব দ্রুত ইক্ষু কর্তন ও মাড়াই করা।

২. রোপা ইক্ষু চাষ (এসটিপি) প্রযুক্তি

পরিবর্তিত জলবায়ুতে ইক্ষু চাষের জন্য রোপা ইক্ষু চাষ প্রযুক্তি সুপারিশ করা হয়েছে, যা ইক্ষু চাষকে অধিক লাভজনক করতে পারে। নিম্ন তাপমাত্রা এবং মাটিতে অপর্যাপ্ত রস থাকার কারণে আখের অঙ্কুরোদগম কম হওয়া সত্ত্বেও জমিতে পর্যাপ্তসংখ্যক মাড়াইযোগ্য আখ উৎপাদনের জন্য রোপা ইক্ষু চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে রোপা ধানের মতো এক বা দুই চোখবিশিষ্ট বীজখ- থেকে পলিব্যাগে, পরিবেশবান্ধব ছোট্ট চটের ব্যাগে, বীজতলায় কিংবা সরাসরি গাছে চারা উৎপাদন করে সেই চারা জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করা হয়। রোপা ইক্ষু চাষের সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় মাত্র ৪০% বীজ ইক্ষুর প্রয়োজন হয়, জমিতে মাড়াইযোগ্য ইক্ষুর সংখ্যা ও ওজন বৃদ্ধি হয়। প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এতে বীজ বর্ধন অনুপাত বৃদ্ধি পায় (১:৩০)। ইক্ষুর ফলন ও অর্থনৈতিক সুবিধা ৫০-৮০% ভাগ বৃদ্ধি পায়। গ্রাম এলাকায় অধিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গ্রামের মহিলারাও রোপা ইক্ষু চাষের জন্য চারা উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩. সাথীফসল প্রযুক্তি

ইক্ষু একটি দীর্ঘমেয়াদি ফসল। ফলে স্বল্পমেয়াদি ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়। ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব বেশি হওয়ায় দুই সারির মাঝে স্বল্পমেয়াদি ফসলের চাষ করা যায়। কৃষকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাথীফসল প্রযুক্তি এবং জোড়া সারিতে রোপণকৃত ইক্ষুর সাথে পর্যায়ক্রমিক একাধিক সাথীফসল চাষ প্রযুক্তি সুপারিশ করা হয়েছে। সাথীফসলের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্যাকেজগুলো হলো এক সারি ইক্ষুর সাথে আলু/পেঁয়াজ/রসুন; জোড়া সারি ইক্ষুর সাথে আলু-মুগডাল/সবুজ সার; জোড়া সারি ইক্ষুর সাথে পেঁয়াজ-মুগডাল/সবুজ সার; জোড়া সারি ইক্ষুর সাথে রসুন-মুগডাল/সবুজ সার; জোড়া সারি ইক্ষুর সাথে বাঁধাকপি-মুগডাল/সবুজ সার; জোড়া সারি ইক্ষুর সাথে ফুলকপি-মুগডাল/সবুজ সার; জোড়া সারি ইক্ষুর সাথে ব্রোকলি-মুগডাল/সবুজ সার; জোড়া সারি ইক্ষুর সাথে পেঁয়াজ/সরিষা/সবুজ সার; জোড়া সারি ইক্ষুর সাথে পেঁয়াজ/মসুর/সবুজ সার। স্বল্পমেয়াদি ডাল ফসলের চাষের ফলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায় এবং আমিষের উৎস হিসেবে প্রতিদিনের খাদ্যে ব্যবহার করতে পারে।

৪. মৃত্তিকা ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধিতে মাটির খদ্যোপাদান এবং সারের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগের ফলে ইক্ষুর ফলন, চিনি ও গুড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বিএসআরাই ১২টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল যেখানে ইক্ষুর চাষ হয়ে থাকে সেই সকল অঞ্চলের জন্য ইক্ষুর জন্য মুড়ি ফসলসহ সাথীফসল চাষের জন্য সারের সঠিক মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিরূপণ করে।

৫. পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

ইক্ষু ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পোকামাকড় অন্যতম। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ইক্ষুর পোকামাকড় বৃদ্ধি পায়। মার্চ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যেই বেশির ভাগ ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ দেখা যায়। জুন মাসে বৃষ্টি বাদল বাড়ার সাথে সাথে ইক্ষুর ডগার মাজরা পোকার আক্রমণ বেড়ে যায়। ইক্ষুর কান্ডের মাজরা পোকার আক্রমণ ও গোড়ার মাজরা পোকার আক্রমণ পরিবর্তিত জলবায়ুগত কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রা কমে গেলে আক্রমণের প্রাদুর্ভাব কমে যায়। শুধু পোকামাকড়ের কারণেই প্রতি বছর গড়ে ২০% উৎপাদন এবং ১৫% চিনি আহরণ হ্রাস পায়। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত আখের ৭০টি পোকামাকড় শনাক্ত করা হয়েছে যাদের মধ্যে ৭/৮টি অতি মারাত্মক। জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে কোনো কোনো বছর বিশেষ কোনো কোনো পোকার ব্যাপক আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় এবং ফলনের ওপর সাংঘাতিকভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গবেষণা কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের মধ্যে ক্ষতিকর ও উপকারী পোকামাকড় শনাক্তকরণ, ক্ষতিরধরন, আক্রমণের লক্ষণ, ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করে পোকামাকড়গুলোকে মুখ্য, গৌণ প্রভৃতি ভাগে ভাগ, তাদের জীবন বৃত্তান্ত ও প্রজন্ম সংখ্যা, মৌসুমি প্রাচুর্যতা প্রভৃতি নিরূপণ করা হয়। জৈবিক উপায়ে ডগার মাজরা পোকা, কান্ডের মাজরা পোকা এবং পাইরিলা দমন; কালচারাল ও যান্ত্রিক উপায়ে সব পোকার দমন ব্যবস্থা; রাসায়নিক প্রয়োগে ডগার মাজরা পোকা, সাদা কীড়া, উঁইপোকা, শিকড়ের মাজরা পোকা, কান্ডের মাজরা পোকা ও আগাম মাজরা পোকা দমন; ইক্ষুর জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা সুপারিশ করা হয়েছে।

৬. রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

পরিবর্তিত জলবায়ুগত কারণে রোগের অনুকূল আবহাওয়ায় ইক্ষুর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাংলাদেশের আবহাওয়া ইক্ষুর রোগবিস্তার ও প্রসার লাভের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৪০টি রোগ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় ও বিভিন্ন জাতের ইক্ষুতে লক্ষ করা গেছে। এদের মধ্যে ২২টি ছত্রাক, ৪টি ব্যাকটেরিয়া, ২টি মাইকোপ্লাজমা, ১টি ভাইরাস, ২টি কৃমি, ২টি পরজীবী আগাছা দ্বারা সংগঠিত হয় বাকি ৭টি রোগ অন্যান্য কারণে সংগঠিত হয়ে থাকে। শনাক্তকৃত ৪০টি রোগের মধ্যে ১০টি মুখ্য এবং বাকি রোগগুলো গৌণ। ইক্ষু রোগের নাম, রোগের কারণ, রোগের লক্ষণ নিরূপণ করে তার প্রতিকার ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয়েছে। ইক্ষুর বীজ শোধন পদ্ধতি, রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজ আখ উৎপাদন ও ব্যবহার, সমন্বিত রোগ দমন পদ্ধতি এবং আখের রোগ পঞ্জিকা উদ্ভাবন করা হয়েছে। লাল পচা রোগের প্রকোপ কমানো ও মোজাইক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে রোগ প্রতিরোধী জাতের রোগমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন বীজ ইক্ষু ব্যবহার সুপারিশ করা হয়েছে; সাদা পাতা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্দ্র-গরম বাতাসে শোধিত বীজ ইক্ষু ব্যবহার সুপারিশ করা হয়েছে; মুড়ি খর্বা ও স্মাট রোগ দমনের জন্য গরম পানিতে শোধিত বীজ ইক্ষু ব্যবহার সুপারিশ করা হয়েছে; বীজ পচা রোগ দমনের জন্য ব্যাভিস্টিন এবং বিজলি ঘাস দমনের জন্য বিভিন্ন মাত্রায় ইউরিয়া প্রয়োগ সুপারিশ করা হয়েছে।

৭. স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ গুড় উৎপাদন

গুড় প্রস্তুতে ইক্ষু রস পরিশোধনে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য হাইড্রোজের বিকল্প হিসেবে বন ঢেঁড়স ও উলট কম্বল গাছের নির্যাস ব্যবহারের মাত্রা এবং ব্যবহার পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে। মাটির পাত্র রঙ করে গুড় ভরে মাটির পাত্রের মুখ মোম বা পলিথিন বা মাটি দ্বারা বন্ধ করে দীর্ঘদিন গুড় সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। পাটালি গুড় এবং গুড়া দানাদার গুড় পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৮. তাৎক্ষণিকভাবে পানি ও পুষ্টির জন্য ইক্ষুর রস ব্যবহার

বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর তাৎক্ষণিকভাবে পানি ও পুষ্টির জন্য ইক্ষুর রস ব্যবহার করার লক্ষ্যে বাড়ির আঙিনায় বা বাড়িসংলগ্ন মাঠে চিবিয়ে খাওয়া আখের কয়েকটি ঝাড় লাগিয়ে উৎপাদিত আখ সারা বছর চিবিয়ে খাওয়া বা রস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৯. উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার

সাধারণত ইক্ষু থেকে প্রাপ্ত ছোবরা চিনিকলের ব্রয়লারে ব্যবহার হয়ে থাকে। ছোবরার সামান্য অংশ ব্যবহার করা হয় কাগজ তৈরিতে, আচ্ছাদন, মাশরুম চাষ, গুড় উৎপাদনের জন্য জ্বালানি এবং গৃহস্থালি জ্বালানি হিসেবে। দুর্যোগের সময় ইক্ষুর সবুজ পাতা গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ইক্ষু কর্তনের পর এর সবুজ পাতা গোখাদ্য, শুকনা পাতা জ্বালানি, আচ্ছাদন এবং পচিয়ে জৈব সার তৈরি করা হয়।

১০. টেকসই ইক্ষু গবেষণা ও সম্প্রসারণ

জাতীয় অর্থনীতির বার্ষিক জিডিপিতে ইক্ষুর অবদান ০.৭৪%। প্রতি বছর ইক্ষু হতে জিডিপিতে অবদান টাকার অংকে গড়ে ১২০০-১৫০০ কোটি টাকা। দেশে গড়ে বছরে প্রায় ৭০-৭৫ লাখ টন ইক্ষু উৎপাদিত হয়, যা থেকে বার্ষিক জিডিপি আয় প্রায় ১৫২১.৬৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে গুড় হতে ৮৫২.০০ (০.৪১%) কোটি, চিনি হতে ৩৬৯.০০ (০.১৮%) কোটি, ইক্ষুবীজ হতে ৯২.৬০ (০.০৫%) কোটি, পশু খাদ্য ও জ্বালানি হতে ৮২.৯০ (০.০৪%) কোটি, বাই-প্রডাক্ট হতে ৬৮.৯৪ (০.০২%) কোটি এবং চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু ও রস হতে ৫৬.২৫ (০.০৩%) কোটি টাকা পাওয়া যায়।
ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য শাকসবজি, দানাদার খাদ্য ও ফলমূলের চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশে ইক্ষু চাষ দিনকে দিন নিচু ভূমি চরাঞ্চলে, পাহাড়ি এলাকা ও প্রান্তিক প্রতিকূল পরিবেশপ্রবণ এলাকা যথা- খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা ও লবণাক্ত এলাকায় চলে যাচ্ছে। মোট উৎপাদিত ইক্ষুর ২৩-২৭% চিনি উৎপাদনে এবং ৫৩-৫৭% গুড় তৈরিতে ব্যবহার হয়। পরিবর্তিত জলবায়ুতে চাষের জন্য খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু, পোকামাকড় ও রোগবালাই প্রতিরোধী ইক্ষু জাত উদ্ভাবন এবং চাষের জন্য প্রযুক্তি উদ্ভানে বিএসআরআই কাজ করে যাচ্ছে। ইক্ষু দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিকভাবে জীবন রক্ষায় বিশুদ্ধ পানি ও পুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।